মানবীবিদ্যাচর্চায় দুই নারীর অবস্থানঃ ইণ্ডিরা দেবী চৌধুরানী ও প্রতিমা দেবী

ড. কুমকুম চট্টোপাধ্যায়

প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ (অবসরপ্রাপ্ত), বেথুন মহাবিদ্যালয়

একতি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে মানবীবিদ্যা খুব সাম্প্রতিককালের সংযোতন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানবীবিদ্যার তন্ম বিভিন্ন আণ্ডৌলনের হাত ধরে। তাই পাশ্চাত্যে মানবীবিদ্যা 'Movement born programme' অথবা 'আণ্ডৌলনত্রত কর্মসূচি' হিসেবে চিহ্নিত। [১]

ভারতে ১৯৮১ সালে মুম্বাইতে First National Conference on Women's studies অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই দেশে মানবীবিদ্যা চর্চার একান্ত অভাব লক্ষ্য করে এই সভায় মানবীবিদ্যাকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে ভারতের বেশ কয়েকতি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে মানবীবিদ্যা একতি পৃথক বিষয়ের মর্যাদা লাভ করে। [২]

মানবীবিদ্যা চর্চার বিষয়বস্তু নানাভাবে সংগৃহীত হয়। তার মধ্যে সফল নারীদের ত্রীবনী সংগ্রহ করা একতি অন্যতম প্রচেষ্টা। এই নারীরা একক ভাবে সংগ্রাম করে এগিয়ে যান এবং নারী সমাতের সামনে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এমনই দুই তন নারী ইণ্ডিরা দেবী চৌধুরানী এবং প্রতিমা দেবী। প্রথম তন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং দ্বিতীয় তন তাঁর পুত্রবধূ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর দীর্ঘ সময় তুড়ে এঁদের অবস্থান। সমাতে তখন এক যুগসন্ধিক্ষণ। সামন্ততন্ত্রের আবরণ তখন ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছে। নবত্রাগরণের আলোয় উদ্ভাসিত তখন ভারতীয় সমাত। সেই সঙ্গে চলছে ত্রাতীয়তাবাদী আণ্ডৌলনের বিবিধ প্রস্তুতি। আবার রাত্রনৈতিক আণ্ডৌলন থেকে দূরে সরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বকীয় সমাত ভাবনার প্রমাণ রাখছেন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে। সেই সময় ইণ্ডিরা দেবী ও প্রতিমা দেবী রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি হেঁতেছিলেন অনেকতা পথ। এঁদের নিয়ে আলোচনা করলে এঁদের ত্রীবনের সঙ্গে সমকালীন সমাতও অনেকতাই স্পষ্ট হয়ে যায়। সেই সঙ্গে রবীন্দ্র সান্নিধ্যে থেকে বাংলার নারীসমাতকে তাঁরা যে মুক্তির আলো দেখাতে পেরেছিলেন তা অনিবার্য ভাবেই মানবীবিদ্যাচর্চাকে সমৃঃ করে।

"এককালে যাঁরা শান্তিনিকেতনের কাতে রবীন্দ্রনাথের সহযোগী ছিলেন, যাঁরা হাত মিলিয়েছিলেন তাঁর কাতে, সুর মিলিয়েছিলেন তাঁর গানে, মন মিলিয়েছিলেন তাঁর মননে," [৩] সেই রকম বত্রিশ তন ব্যক্তিত্বকে নিয়ে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রচনা করেছেন 'শান্তিনিকেতনের এক যুগ'। এই বত্রিশ তনের মধ্যে স্থান লাভ করেছেন মাত্র দু'তন নারী — ইণ্ডিরা দেবী চৌধুরানী এবং প্রতিমা দেবী। সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের এই কৃতিত্ব উল্লেখের দাবি রাখে।

ইণ্ডিরা দেবী চৌধুরানী —

রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইণ্ডিরা দেবী চৌধুরানীকে নিয়ে বিশেষ চর্চার প্রয়োতন আছে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণে। 'ঠাকুরবাড়ির অণ্ডরমহল' বইতিতে লেখিকা চিত্রা দেব - এর কথায়, "কৈশোরেই তিনি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ছিন্নপত্রাবলীর প্রাপক। অন্য কোন ক্ষেত্রে যদি তাঁর কিছুমাত্র দান নাও থাকত তা হলেও ক্ষতি ছিল না। কেননা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যিনি এই অসামান্য চিঠিগুলি লিখিয়ে নিতে পেরেছিলেন তাঁর অসামান্যতা সম্পর্কে সণ্ডেহ ত্রাগতেই পারে না।" [৪] দ্বিতীয়ত ইণ্ডিরা দেবী রীতিমত বিদুষী ছিলেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেই সময় তিনি ইংরাত্রী ও ফারসি ভাষা নিয়ে বি.এ. পাস করেন। তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি নিশ্চই তাঁকে সহায়তা করেছিল। কিন্তু তিনি যে সেই সুযোগ কে কৃতিত্বের সঙ্গে কাতে লাগাতে পেরেছিলেন সে কথা স্বীকার করতেই হবে। তৃতীয়ত রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁর দান অনস্বীকার্য। তাঁর সাংগীতিক প্রতিভাও তাঁকে অনন্যতা দান করেছিল। চতুর্থত অনুবাদের কাতেও তিনি রীতিমত পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। এছাড়াও তাঁর সাংস্কৃতিক সচেতনা, সাংগঠনিক কর্মদক্ষতা এবং তার লেখা অমূল্য কিছু গ্রন্থ তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

এই আলোচনা শুরু হচ্ছে ইণ্ডিরা দেবী চৌধুরানীর ত্রীবনী ও বিদ্যাচর্চা দিয়ে। তারপর সংগীতের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান। তারপর এসেছে ছিন্নপত্র ও চিঠিপত্র পঞ্চম খন্ড। তারপর তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা স্মৃতি সম্পুত - দুই খন্ড। শেষ কালে এসেছে রাণী চণ্ডের লেখনীতে তুলে ধরা 'বিবিদি'। বিবি ইণ্ডিরার ডাক নাম।

ত্রীবনী ও বিদ্যাচর্চা —

ইণ্ডিরা দেবী চৌধুরানী (২৯.১২.১৮৭৩ - ১২.৮.১৯৬০) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা, মাতা জ্ঞানদানণ্ডিনী দেবী। ১৮৭৭ সালের মে মাসে বালিকা ইণ্ডিরা তাঁর মাতা এবং ত্রেষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা কবীন্দ্রনাথের সঙ্গেঁ ইংল্যান্ড যান। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডে পৌঁছান ১৮৭৮ সালের অক্টোবর মাসে। দুই বছরের কিছু বেশি সময় ইংল্যান্ডে থেকে ইণ্ডিরা দেবী পিতামাতার

সঙ্গে কলকাতায় ফিরে আসেন। এরপর ইণ্ডিরা প্রথমে সিমলায় অকল্যান্ড স্কুলে ও পরে কলকাতার লরেতো হাউস কনভেন্তে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮৯২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ফারসি ও ইংরাত্তি ভাষা সহ বি.এ পাস করেন। ফারসি ভাষায় প্রথম স্থান লাভ করে তিনি 'পদ্মাবতী পদক' লাভ করেন।[৫]

১৯৪১ সালে স্থায়ী ভাবে বসবাসের ত্ন্য ইণ্ডিরা দেবী শান্তিনিকেতনে আসেন। শান্তিনিকেতনে থাকার সময় তিনি সঙ্গীত ভবনের প্র-নেত্রী, বিশবভারতী স্বরলিপি সমিতির সদস্য, আলাপিনীর সংগঠক, 'ঘরোয়া' পত্রিকার প্রকাশ ইত্যাদি বিবিধ কর্মে নিবিষ্ট ছিলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি বিশ্বভারতীর অস্থায়ী উপাচার্য পদে বৃত হন।[৬]

মাতা জ্ঞানদানণ্ডিনীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নারী প্রগতির অন্যতম নেত্রীরুপে ইণ্ডিরা দেবী, আত্তীবন নানা ভাবে সচেষ্ট ছিলেন। Bengals Women's Education League, All India Women's Conference, হিরন্ময়ী বিধবাশ্রম, সংগীত সংঘ, আলাপিনী মহিলা সমিতি ইত্যাদির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট যোগ ছিল।[৭]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৪ সালে ইণ্ডিরা দেবীকে ভুবনমোহিনি স্বর্নপদক প্রদান করেন। বিশ্বভারতী তাঁকে সর্বোচ্চ 'দেশিকোত্তম' দেয় ১৯৫৭ সালে। রবীন্দ্রভারতী সমিতি এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ঘোষিত পুরস্কার ইণ্ডিরা দেবীকে প্রদান করেন ১৯৫৯ সালে। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি নারীর উক্তি (১৯২০), রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেনীসংগম (১৩৬১ বঙ্গাব্দ), বাংলার স্ত্রী আচার (১৩৬১ বঙ্গাব্দ), রবীন্দ্র স্মৃতি (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ)। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে রচিত 'হিণ্ডু সংগীত (১৩৫২ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের নামও এখানে উল্লেখযোগ্য। [৮]

অনুবাদের কাতেও ইণ্ডিরা দেবী যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। অনুবাদের কাত নিঃসণ্ডেহে কঠিন। কিন্তু ইণ্ডিরা দেবী সেই অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রাণ সঞ্চার করতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা তিনি নিতে অনুবাদ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিতেও সে কথা স্বীকার করেছেন। ইণ্ডিরা অনুবাদের ভার নিলে তিনি যততা নিশ্চিন্ত হতেন ততখানি ভরসা আর কারও উপর ছিল না। চিঠিতে লিখেছেন, "তোর সব তর্তমাগুলিই খুব ভালো হয়েছে। . . . . এই মাত্র তোর তর্তমা গুলি অপূর্বকে দেখালুম — সে বললে আমার কবিতার এত ভালো তর্তমা সে আগে দেখে নি।" (০৬/০১/১৯২৯)। আবার 'অপানযাত্রী' অনুবাদের দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ ইণ্ডিরাকে দিয়েই নিশ্চিন্ত হতে চায়।[৯] "কেউ কেউ প্রস্তাব করেছেন অপানযাত্রী ডায়ারিতা তর্জ্জমা করবার। . . . ভয়ে ভয়ে বলচি যদি তোর হাত খালি থাকে একতু চেষ্টা করে দেখতে পারিস।" [১০]

রবীন্দ্র রচনার অনুবাদ ছাড়াও ইণ্ডিরা অনুবাদ করেন 'চার ইয়ারী কথা' র। এই বইতি তাঁর স্বামী প্রমথ চৌধুরীর লেখা। 'তেলস্ অব ফোর ফ্রেন্ডস' একতি উল্লেখযোগ্য অনুবাদ। এ ছাড়া ইণ্ডিরা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে যুগ্মভাবে অনুবাদ করেন মহর্ষির আত্মত্তীবনী 'দি অতোবায়োগ্রাফি অব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তেগোর।' এই দুতি ক্ষেত্রেই বাংলা থেকে ইংরাত্তীতে অনুবাদ করা হয়েছে। আবার ফরাসি থেকে বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রেও ইণ্ডিরা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন। প্রমথ চৌধুরীর সান্নিধ্য তাঁকে আরও শানিত করেছিল কারণ প্রমথ চৌধুরী ছিলেন ফরাসী ভাষায় সুপন্ডিত। ইণ্ডিরার যে চারতি অনুবাদ শ্রুার সঙ্গে স্মরণ করা উচিৎ সেগুলি হল রেনে গ্রুসের 'ভারতবর্ষ', পিয়ের লোতির 'কমল কুমারিকাশ্রম', মাদাম লেভির 'ভারত ভ্রমণ কাহিনী' এবং আণ্ডে তিদের লেখা 'ফরাসি গীতাঞ্জলীর ভূমিকা।' [১১]

সংগীত—

পারিবারিক সংগীতপ্রীতি বালিকা বয়স থেকে অতি সহত্তেই ইণ্ডিরা দেবীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকার সংগীতেই তিনি পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁর রচিত কিছু ব্রহ্মসংগীতও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন প্রথম যুগের রবীন্দ্র সংগীতের ভান্ডারী। তৎকালীন বাংলাদেশে সংগীত শিক্ষা ও প্রচারে তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। [১২]

যেহেতু ইণ্ডিরা দেবীর নিতান্ত বালিকা বয়স থেকেই সংগীতের বিষয়ে সহত্তত দক্ষতা ছিল, সেহেতু পরবর্তী কালে রবীন্দ্র সংগীতের ক্ষেত্রে তার বিরাত প্রভাব পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বহু গানের সুর বিলুপ্ত হয়ে যেত যদি না ইণ্ডিরা স্মৃতিতে তা অতুত ভাবে ধরে রাখতেন। তিনি প্রায় দুশো রবীন্দ্র সংগীতের স্বরলিপি করে ভবিষ্যৎ প্রত্তমকে ঋণ করে দিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রয়ানের পর বিশ্বভারতী রবীন্দ্র সংগীতের সুর সংস্করণের ত্ন্য উদ্যোগ নিলে ইণ্ডিরা দেবী নিতের স্মৃতি থেকে উণ্ডার করেন ভানুসিংহের পদাবলী ও কালমৃগয়ার সুর। রবীন্দ্র স্মৃতি গ্রন্থের নাত্যস্মৃতি অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন, " . . . দুতি পুরনো গীতিনাতিকাকে উণ্ডার করায় আমার কিছু হাত ছিল - কালমৃগয়া আর ভানুসিংহের পদাবলী। ভানুসিংহের পদাবলীর যে অল্প সংখ্যক গান তনতুম, সেগুলিকে সাতিয়ে নাত্যরূপ দিয়েছিলুম। এখন এই আকারেই নাতিকাতি অভিনীত হয়। কালমৃগয়ার গানও পুরনো ভারতী থেকে আমার মেধাবী ছাত্রী সুচিত্রাকে দিয়ে লিপ্যন্তরিত করেছিলুম।"[১৩]

শৈশবেই দেশি ও বিলিতি উভয় সংগীতে তালিম নিয়েছিলেন। ওস্তাদি হিণ্ডুস্থানী গান তিনি শিখেছিলেন বদ্রীদাস সুকুলের কাছে। বদ্রীদাস সুকুল ১৮৮৭ সালে সুরেনকে ও ইণ্ডিরাকে বাইরের তেতালার ছাদে হিণ্ডুস্থানী গান ও সেতার শেখাতে আসতেন। [১৪] হেমেন্দ্রর মেয়েরা গান

নিয়ে মেতে থাকলেও অভিজ্ঞা ছাড়া আর আর তেমন করে রবীন্দ্র সংগীত চর্চা করেন নি। তাই ইণ্ডিরাকে একাই সব ভার নিতে হয়েছিল। যদিও রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন বাড়ির সব ছেলে মেয়েরাই। যন্ত্রসংগীতেও ইণ্ডিরার হাত ছিল পাকা। সেন্ত পল্‌সের অর্গানিস্ত স্লেতার সাহেবের কাছে পিয়ানো ও সিনর ম্যাঞ্জাতের কাছে তিনি শিখেছিলেন বেহালা। [১৫]

ইণ্ডিরা যে কত গানের স্বরলিপি করেছেন তার ইয়াত্তা নেই। শুধু সুর আর স্বরলিপি রক্ষা করাই নয়, তিনি রবীন্দ্রসংগীতের তত্ত্ব আর তথ্য দুতোকেই সমৃঙ করেছেন — একদিকে স্বরলিপি উঙার করে ও গান শিখিয়ে, অন্যদিকে সংগীত সংক্রান্ত প্রবন্ধ লিখে। 'রবীন্দ্র সংগীতের ত্রিবেনী সঙ্গম' এমনই একতি ছোট্ট বই। এখানে ইণ্ডিরা দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ অপরের সুরে নিত্তের কথা গেঁথে গেঁথে কত নতুন গান সৃষ্টি করেছেন। আবার অপরের কথায় নিত্তের সুর দেওয়ার উদাহরণ যে নেই তা নয়। যাবতীয় ভাঙা গানের তালিকা তৈরি করে ইণ্ডিরা দেখিয়ে দিয়েছেন যে সামান্য অদল বদলের মধ্যে কি অসাধ্য সাধন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সংগীত ক্তাতে এই পুস্তিকা অমুল্য সংযোতন। রবীন্দ্র সংগীত নিয়ে এ যুগের অনেকেই নানারকম আলোচনা করেছেন। ইণ্ডিরার 'সংগীত চিন্তা' বইতি তাদের আলোচনার আকর হিসেবেও গৃহিত হয়েছে। [১৬] ইণ্ডিরার দেওয়া হিসেব থেকে তনা যায় যে রবীন্দ্রনাথের দুশো সাতাসতা ভাঙা গানের বারোতির সুর নেওয়া হয়েছে স্কচ ও আইরিস থেকে। রবীন্দ্র সংগীতে হিণ্ডুস্থানী গানের দানও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। [১৭]

ইণ্ডিরার লেখা রবীন্দ্র সংগীত বিষয়ক প্রবন্ধ অনেক। বহু প্রত্রিকায় তিনি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এগুলির মধ্যে 'সংগীতে রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্র সংগীতের শিক্ষা', 'রবীন্দ্র সংগীতের বৈশিষ্ট্য', 'রবীন্দ্রনাথের সংগীত প্রভাব', 'স্বরলিপি পঙতি', শান্তিনিকেতনে শিশুদের সংগীত শিক্ষা', 'হারমণি বা স্বরসংযোগ', 'রবীন্দ্র সংগীতে তানের স্থান', 'রবীন্দ্রনাথের গান', বিশ্ঙ রবীন্দ্র সংগীত', 'হিণ্ডি সংগীত', 'আমাদের গান', 'স্বরলিপি', 'The Music of Rabindranath Tegore' উল্লেখের দাবি রাখে। [১৮]

ছিন্নপত্র/ছিন্নপত্রাবলী

'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের তন্য আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছে যতখানি ঋনি, ইণ্ডিরা দেবীর কাছেও ততখানি। বিশ্বসাহিত্যের নিরিখে 'ছিন্নপত্র' এক অনবদ্য সৃষ্টি। আর এই সৃষ্টির পিছনে অদৃশ্য নায়িকা ইণ্ডিরা দেবী। অনেক পরিচিতের মধ্যে থেকে ইণ্ডিরাকে এই পত্রগুলি পাঠাবার তাগিদ অনুভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। [১৯] এ থেকেই ইণ্ডিরার যোগ্যতা সম্পর্কে আমরা আণ্ডাত করতে পারি।

'ছিন্নপত্রে' রবীন্দ্রনাথ ইণ্ডিরাকে লিখেছেন, "তোকে আমি যে-সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোন লেখায় হয় নি।... তোর অকৃত্রিম স্বভাবের মধ্যে একতি সরল স্বচ্ছতা আছে — সত্যের প্রতিবিম্ব তোর ভিতরে বেশ অব্যাহত ভাবে প্রতিফলিত হয়।... সহত সত্য আকর্ষণ করে নেবার ক্ষমতাতি তোর আছে;" [২০] এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে ইণ্ডিরা অনায়াসে আমাদের পরিচিত তন হয়ে ওঠেন। আবার রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "যে শোনে এবং যে বলে এই দুতনে মিলে তবে রচনা হয়" [২১] —

১৮৮৭ থেকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ইণ্ডিরা দেবীকে যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন ছিন্নপত্র গ্রন্থখানি মূলত তারই সংকলণ; কেবল প্রথম আতখানি চিঠি শ্রীশচন্দ্র মতুমদারকে লেখা। এই সময় লিখিত যাবতীয় চিঠি ইণ্ডিরা দেবী দুতি খাতায় স্বহস্তে নকল করে রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়েছিলেন। এই খাতা দুতি অবলম্বনে ১৩১৯ বঙ্গাব্দে 'ছিন্নপত্র' প্রকাশিত হয়। [২২] সেই সময় অনেক চিঠিই রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থভুক্ত করেন নি। কারণ বেশ কিছু চিঠির কোন কোন অংশ সাধারণের সমাদার যোগ্য নয় মনে করে বাদ দিয়েছিলেন। বর্তিত অনেক গুলি পত্র ও পত্রাংশ এবং মূল দুইতি খাতা অবলম্বনে ১৯৬০ সালের অক্টোবরে ছিন্নপত্রাবলী গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগের উদ্যোগে। [২৩]

চিঠিপত্র - ৫ [২৪]

'ছিন্নপত্র' ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইণ্ডিরা দেবীর সম্পর্ক প্রকাশিত হয়েছে চিঠিপত্র - ৫ খন্ডে প্রকাশিত ৮৪ তি চিঠির মাধ্যমে। ১৯১৩-১৯৪১ সময়কালে ইণ্ডিরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি এই খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। 'ছিন্নপত্রের' পাশাপাশি এই চিঠি গুলিও ইণ্ডিরা দেবীর চরিত্রকে আমাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলেছে। এই চিঠি গুলি অনেক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত এই চিঠিগুলির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইণ্ডিরা দেবীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রকাশিত। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন, তাঁর বিভিন্ন কাত, স্বত্তাতির প্রতি অভিমান, ইণ্ডিরার প্রতি তাঁর স্নেহ ও ইণ্ডিরার যুক্তিবোধ সম্পর্কে তার আস্থা – এই রকম আরও নানা বিষয় এই চিঠিগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে। তৃতীয়ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর সবরকম অনুভব একতন যোগ্য মানুষ হিসেবে ইণ্ডিরা দেবীর কাছে প্রকাশ করেছেন। সেখানে নারী পুরুষ ভেদ করার কোন প্রশ্ন আসে নি। অন্যভাবে বলতে গেলে চিঠিগুলির মধ্যে কোন লিঙ্গ অভিমান (gender bias) নেই। ইণ্ডিরা একতন নারী হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চিঠি লেখার সময় তথাকথিত কোন মেয়েলি বিষয় নিয়ে লেখেননি। এর মাধ্যমে ইণ্ডিরার প্রতি তাঁর মনোভাব যেমন প্রকাশিত তেমনই নারী-পুরুষের উর্ধে একতন মানুষ হিসেবে তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত। সেদিক থেকে ইণ্ডিরা দেবীও তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চিঠিপত্র-৫-এ সংকলিত ৮৪ তি চিঠির মধ্যে প্রথম চিঠিতি শুরু হচ্ছে, "বিবি, তোর চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হয়েছি। সমুদ্র পেরিয়ে অবধি আত্মীয়স্বতনদের এরকম আনুপূর্ব্বিক খবর আর পাই নি।... আপনার লোকেরা যারা মাঝে মাঝে লেখে, তারা, আমার পক্ষে কোন্ খবরতা যে

খবর, তা ভেবেই পায় না।" ইণ্ডিরা দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কততা মানসিক বোঝাপড়া ছিল এই কথাগুলি তারই প্রমাণ। এই চিঠিতি আরও একতি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে 'গীতাঞ্জলি'-র ইংরেতিঅনুবাদ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেতিজ্ঞান ও ব্যক্তিগত অনুভূতি অকপতে তানিয়েছেন। এই চিঠির মূল্য এখানেই যে ৬ই মে ১৯১৩ সালে লেখা। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির কয়েক মাস আগে। বর্তমানে নোবেল প্রাপ্তির শতবর্ষের পর এই চিঠিতির মূল্য অপরিসীম। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১০ নম্বর চিঠিতিও চিহ্নিত করা যেতে পারে যেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "মোতের উপর আমার পারিবারিক আসক্তি প্রবল নয়, কোন মানুষ আমার পরিবার নামক একতা শ্রেণীর মধ্যে পড়ে গেছে বলেই সে যে অন্য মানুষের চেয়ে আমার কাছে মনোরম তা নয় . . .।" তাঁর তীবনচর্চায় এই উপলব্ধি বার বার প্রকাশিত হয়েছে। অনেকগুলি চিঠিই নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সব এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। শেষ চিঠি ১৩ই মে, ১৯৪১ সালে লেখা, প্রয়ানের কয়েক মাস আগে। নিতে লেখার ক্ষমতা না থাকলেও কষ্ট করে ছ'লাইন লিখেছিলেন পরম স্নেহাস্পদা বিবিকে। এখানে চিঠির প্রাপক হিসাবে ইণ্ডিরা দেবীর ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না।

স্মৃতিসম্পুত - প্রথম খন্ড [২৫]

ইণ্ডিরা দেবী তাঁর 'তীবনকথা' (লেখিকা প্রদত্ত নাম 'ইণ্ডিরা দেবী চৌধুরাণীর তীবনকথা) লেখা আরম্ভ করেছিলেন ১৯৫৩ সালের ৭ই আগস্ত। ভূমিকার শেষে প্রদত্ত তারিখক্ষ্ম ১৮ই আগস্ত, ১৯৫৩। এরপর তিনি যখন যেমন সুযোগ পেয়েছেন সেইভাবেই ক্রমশ অগ্রসর হয়েছেন। শেষ লেখার তারিখ ঃ ২০ই ডিসেম্বর,১৯৫৫। যে খাতাতিতে ইণ্ডিরা দেবী তাঁর তীবন কথা লিখেছেন তার প্রথম অংশে জ্ঞানদানণ্ডিনী দেবীর স্মৃতি কথা ('আমার তীবন কথা') রয়েছে। জ্ঞানদানণ্ডিনীর এই স্মৃতিকথা তাঁর বৃদ্ধাবস্থায় কথিত এবং কন্যা ইণ্ডিরা দ্বারা অনুলিখিত। মাতা ও কন্যার তীবনস্মৃতি এই ভাবে একই পান্ডুলিপিতে যুক্ত হয়ে আছে।

ইণ্ডিরা দেবীর তীবনকথা 'স্মৃতিসম্পুত - প্রথম খন্ডে' মুদ্রিত হয়েছে। এখানে ইণ্ডিরা দেবীর পিতৃগৃহ অর্থাৎ ঠাকুরবাড়ি ও শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সমকালীন সমাত আশ্চর্য তীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে।

'তীবন কথা' য় ইণ্ডিরা দেবী লিখেছেন 'তাবলো' তিনিসতা সেকালে খুব হত। পান্ডুলিপির এক তায়গায় তাবলো (Tableau) বিষয়ে যে অংশতুকু লিখে ইণ্ডিরা দেবী বর্তন করেছেন প্রসঙ্গক্রমে এখানে সেতি উদ্ধৃত হল — "একবার মনে আছে কোনো বিদেশিনী সভার নৈমিত্তিক অধিবেশনের পালা কলকাতায় পড়ায় সরলা দিদি (আমরা আদর করে তাঁকে ডাকতুম 'সল্লি', তাই নিয়ে তখনকার ছেলেরা হাসত) এবং আমি দুতনেরই উপর অতিথি - বিনোদনের ভার পড়েছিল। . . . আমি মনে মনে ভাবলুম স্ত্রী লোক নিয়েই যখন কারবার, তখন বিদেশিনীর কাছে আমাদের স্বদেশিনীর মহিমাকীর্তন করাই প্রশস্ত। তাই যুগে যুগে ভারতনারীর এক মহিমময়ী প্রতিকের অবতারণা করলুম, যথা ঃ (১) বৈদিক যুগে মৈত্রেয়ী (২) পৌরাণিক যুগে সীতা ও সাবিত্রী (৩)বৌদ্ধ যুগে মালিনী (৪) মধ্যযুগে মীরাবাই (৫) মুসলমান যুগে অহল্যাবাই (৬) বৃতিশ যুগে রাণী ভবানী — এই কতনই বোধহয় ছিলেন।" এই বক্তেব্যের মধ্যে দিয়ে একই সঙ্গেঁ ইণ্ডিরা দেবীর ভারতেতিহাস চেতনা, নারী চেতনা এবং স্বাধীন চিন্তা ও চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। কালানুক্রমিক ভাবে তিনি ভারতীয় নারীদের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করেছেন, সেখানে একতন ভারতীয় হিসেবে এবং একতন নারী হিসেবে তাঁর স্বকীয়তা ব্যক্ত হয়েছে।

একতন নারী হিসেবে তৎকালীন সমাতেনারীর অবস্থান সম্পর্কে দু'তিনতি মন্তব্য 'স্মৃতি সম্পুত' থেকে তুলে ধরা যায়।" স্বামীভাগ্যই মেয়েদের তীবন এবং বুঝিবা কতকাংশে স্বভাবকেও নিয়ন্ত্রিত করে।" (পৃঃ ১৭) আবার " স্বামীভাগ্যই স্ত্রীলোকের ভাগ্য; বাপের বাড়ি যার যেমনই-হোক-না-কেন।" (পৃঃ ২৩) অন্য এক তায়গায় বলছেন, "আমরা তো যুরোপীয়াদর মত শুধু স্বামীতিকে বিয়ে করি নে, তার গোতা গুষ্টির মন যোগাতে হয়।" (পৃঃ ১৩৭) বর্তমান পরিপেক্ষিতে আর একতি মন্তব্য খুব গুরুত্বপূর্ণ- " শিখ ভাড়াতের আর-একতা প্রথা দেখেছিলুম, ওদের মেয়েরাও একতা করে ছোতো 'কৃপাণ' সঙ্গে রাখে। এই নারী-ধর্ষণের দুর্দিনের পক্ষে মণ্ড নিয়ম নয়।" (পৃঃ ১৫১) এই বক্তব্য থেকে সেই সময়কার সামাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা ধারণা করতে পারি আতকের পরিস্থিতির সঙ্গেঁ মিলিয়ে।

স্মৃতিসম্পুত - দ্বিতীয় খন্ড [২৬]

এই খন্ডে তিনতি সংকলন আছে। প্রথম সংকলনতি 'রোতনামচা' বা 'দিনলিপি' – লেখার সময় ২৬ এপ্রিল, ১৯২৫ - ১৫ই আগস্ত ১৯২৫। লেখার সূত্রপাত বালিগঞ্জে কমলালয়ে বসবাসকালে।

দ্বিতীয় সংকলন 'শান্তিনিকেতন'। লেখার সময় ১লা তানুয়ারী ১৯৫৭ থেকে২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭। রোতনামচারই ধারাবাহিকতা।

তৃতীয় সংকলন - এ আছে সংগীত ভবন ও দিনলিপি। ১৯৪২ - ১৯৪৫ এই সময়কালে রচিত।

বিবিদি [২৭]

রাণী চণ্ডের 'সব হতে আপন' বইতিতে ইণ্ডিরা দেবী যেন পাঠকের একেবারে চোখের সামনে এসে দাঁড়ান এক অদ্বিতীয়া নারী হিসেবে। তাঁর

ডাক নাম ছিল বিবি। লেখিকার তুকরো তুকরো বর্ণনায় এই বিবিদি জীবন্ত হয়ে ওঠেন, " ঘড়ির কাঁতা ধরে চলতেন বিবিদি। শীতের দুপুরে তিনকোণা করে শালখানি পিঠের উপর ফেলে যখন এসে দাঁড়াতেন সিঁড়ির কাছে - বুঝতাম এখন তিনতে বেজেছে।" আবার ঘরের কোনে একতা চেয়ারে বসতেন, কোলে থাকত একতা শৌখিন ঝুড়ি - সেলাইয়ের সরঞ্জাম - ছুঁচ সুতো ইত্যাদিতে ভরা। বিবিদি গান শেখাতে শেখাতে সর্বদা একতা না একতা কিছু রিফু করে চলতেন। শাড়ি, মশারি, বিছানার চাদর, ওয়াড়, জমা কিছু-একতা থাকতই হাতের কাছে।" ইণ্ডিরা দেবী নিজেও 'জীবন কথায়' লিখেছেন "আমি রিপু ছাড়া কোনো সেলাইয়েই বিশেষ পারদর্শী হই নি।"

সময় ধরে গান শেখাতেন না বিবিদি। যতক্ষণ না গাইয়েদের গলার সুরতি ঠিকমত উঠছে ততক্ষণ অবধি সমানে গেয়ে যেতেন। খালি গলায়ই গাইতেন, কোনো বাজনা থাকত না ক্লাসে। উৎসাহ ছিল সমান সকল দিকে। 'কালমৃগয়ার' গান বিবিদিই এসে শেখালেন, ছোতোদের দিয়ে অভিনয়ও করালেন।

আবার অন্য এক বিবিদির সঙ্গে রাণী চণ্ড আমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। বিবিদির সঙ্গে গল্প করা ছিল বড়ো আমোদের ব্যাপার। বিবিদি যেন চলন্ত ছবির মত প্রসঙ্গ পাল্তে পাল্তে গল্প বলে যেতেন। গল্পের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যেন চলতে থাকতাম, দেখতে থাকতাম। জনতামও কত।

সরোজিনী নাইডু বিবিদির বহুকালের বন্ধু। যখনই আসতেন বিবিদির সঙ্গে বসে গল্প করতেন। বিবিদিই বলতেন। তিনি শুনতেন। অনেকক্ষণ পর যখন উঠতেন, গা মোড়ামুড়ি দিতে দিতে বলতেন "ও ডিয়ার ডিয়ার বিবি গোততু ক্যালকাতা ভায়া বম্বে।" এখানে ইণ্ডিরা বা বিবিদি তাঁর যাবতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক উজ্জ্বল, গুনী ও ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব।

প্রতিমা দেবী

রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধু প্রতিমা দেবীকে বাঙালী নারী আণ্ডোলনের এক অন্যতম পথিকৃৎ বললে বোধহয় অত্যুক্তি করাহয় না। ঠাকুরবাড়িতে প্রথম বিধবা বিবাহের নায়িকা তিনি। যদিও রবীন্দ্রনাথের ছত্রছায়া তাঁকে অনেকতাই রক্ষা করেছিল তবু সেই যুগের নিরিখে তাঁর লড়াইতা বড় কম ছিল না। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথের কাছে থেকে তাঁর আদর্শকে বাস্তবায়িত করার গুরু দায়িত্ব তাঁকে বহন করতে হয়েছিল এবং সেগন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়েছিল সেই কাততাও যথেষ্ট কঠিন ছিল। তৃতীয়ত শান্তিনিকেতনের নৃত্য আণ্ডোলনের তিনিই মূল উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। চতুর্থত গ্রামের মেয়েদের মধ্যে সচেতনা তৈরি করা এবং তাদের স্বনির্ভর করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা — এখানেও প্রতিমা দেবীর উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। তাছাড়া তাঁর শিল্প চেতনা শান্তিনিকেতনের শিল্প ও সংস্কৃতিকে সমৃঞ করেছিল। তাঁর কিছু বাংলা ও ইংরেতি রচনা, কিছু আঁকা ছবি ও নানা শিল্প কর্ম তাঁর মানবসত্তার সম্পূর্ণতাকে প্রকাশ করে।

এই পর্বতি শুরু হচ্ছে প্রতিমা দেবীর জীবনী দিয়ে। তারপরের প্রসঙ্গ তাঁর শিক্ষা। পরবর্তী পর্যায়ে নৃত্যকলা যেখানে তিনি তাঁর বিরাত অবদান রেখেছেন। সাহিত্যচর্চা ও সমাজসেবা তার পরবর্তী অধ্যায়। চিঠিপত্র - ৩য় খন্ড নিয়ে আলোচনায় তার শেষ।

জীবন [২৮]

রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর (১৮৯৩-১৯৬৯) জন্ম ঠাকুর পরিবারেরই অপর মহলে, জোড়াসাঁকোর ৫ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের মামার বাড়িতে। প্রবাদ প্রতিম দুই চিত্রশিল্পি গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ তাঁর দুই মামা। তাঁদের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী বিনয়নী দেবী শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা প্রতিমার বাল্যকাল কেতেছিল ঐ মামার বাড়িতেই।

কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর অনেক দিন ধরেই একান্ত ইচ্ছে ছিল সুণ্ডরী এই মেয়েতিকে পুত্রবধূ করে আনেন। কিন্তু তাঁর অকাল প্রয়াণ ঘতে (২৯.১১.১৯০২)। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথও তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক। তাই হয়তো রবীন্দ্রনাথ সেই মুহূর্তে বিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু মেয়ের অভিভাবকরা অপেক্ষা করতে রাজি হন নি। মাত্র দশ বছর বয়সে প্রতিমার বিবাহ হয় রবীন্দ্রনাথের সহপাঠী নীরদনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র নীলানাথের সঙ্গে। এই নীলানাথ ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ও বিনয়িনীর ছোত পিসিমা কুমুদিনীর পুত্র। বিবাহের মাসখানেক পরে একদিন গঙ্গাঁয় সাঁতার কাততে গিয়ে নীলানাথ ডুবে মারা যান। প্রতিমা তখন গঙ্গাঁর পাশেরই একতি বাড়ির ছাদ থেকে নীলানাথের এক ভাইঝির সঙ্গেঁ সেই সাঁতার দেখছিলেন।

মৃণালিনী দেবীর ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হয়েছিল। রথীন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে শিক্ষা শেষ করে ফিরে এলে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহেই রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। প্রতিমা দেবীর বয়স তখন ষোল এবং রথীন্দ্রনাথের বয়স একুশ। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে এতিই প্রথম বিধবা বিবাহ। এখানে উল্লেখ্য দুতি বিবাহই হয় নিকত আত্মীয়ের সঙ্গে। এই বিধবা বিবাহ উপলক্ষ্য করে তখন সমাতে কিছুতা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু রথীন্দ্রনাথ আমল দেন নি। কলকাতার সামাজিক অনুষ্ঠানের পর পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে তিনি শান্তি নিকেতনে চলে যান।

প্রতিমা দেবীর মামার বাড়িতে মেয়েদের লেখাপড়ার বিশেষ প্রচলন ছিল না। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে নানা শিক্ষক ও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষকতায় সার্থক শিক্ষালাভ ও সাহিত্যরুচি অর্জন করেছিলেন তিনি। ছোতমামা অবনীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর ছবি আঁকার হাতে খড়ি পরে নণ্ডলাল বসুর হাতে। শান্তিনিকেতনে আগত বহু গুনীজনের সান্নিধ্য এবং বহুবার বিদেশ ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছিল তাঁর

অনন্য ব্যক্তিত্ব। সেই সঙ্গেঁ নিত্তের সংসার এবং শান্তিনিকেতন আশ্রম দেখাশোনার ভার তিনি নিয়েছিলেন। এই ভাবেই তিনি দিনে দিনে হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের স্নেহময়ী অভিভাবিকা এবং কল্যাণময়ী আশ্রমত্তননী।

রবীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবী প্রসঙ্গেঁ ইণ্ডিরাকে লিখেছেন, " বৌমা চলে গেলে দিনগুলি শ্রীহীন হয়ে পড়ে, ভালো লাগে না, তিনি থাকলেও দেখাশোনা বিশেষ হয় না, তবু তাঁর প্রভাবতা থাকে হাওয়ায়।" [২৯]

শিক্ষা

কার্যত প্রতিমা দেবী যখন যেখানে ছিলেন — ত্তেড়াসাঁকো, শিলাইদহ বা শান্তিনিকেতন – সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথ তাঁর পড়াশুনোর ত্তন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বিয়ের কিছুকাল পরে যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে এসে থাকেন, তখন রবীন্দ্রনাথই তাঁকে ইংরেতি পড়াতে শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ যখন স্থানান্তরে যেতেন তখন শিক্ষার ভার পড়ত আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষক অতিত কুমার চক্রবর্তীর উপর। প্রতিমা দেবীর উপযুক্ত শিক্ষার ত্তন্য রবীন্দ্রনাথই ত্তমাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মারফৎ মার্কিন মহিলা মিস বুর্ডেতকে শিলাইদহে আনিয়েছিলেন।

কয়েক বছর পর প্রতিমা দেবী যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্তেড়াসাঁকোয় এসে বসবাস করেন তখন তিনি ঠাকুর বাড়ির পারিবারিক গৃহবিদ্যালয় 'বিচিত্রা'য় শিক্ষালাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য শিক্ষার ভার দিলেন শান্তিনিকেতন থেকে আগত শিক্ষক অতিত কুমার চক্রবর্তীকে, শিল্প শিক্ষার ভার দিলেন শিল্পী নণ্ডলাল বসুকে। এঁরা দু'ত্তনেই ছিলেন বিচিত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পরবর্তীকালে প্রতিমা দেবী St. Hubert - এর কাছে ফ্রেস্কোর কাত শিখেছিলেন। ফরাসি শিল্পী আঁদ্রে কারপেলেস যখন শান্তিনিকেতনে আসেন তখন তাঁর কাছেও তিনি অঙ্কন বিদ্যার পাঠ গ্রহণ করেছেন। আঁদ্রে কারপেলেস আর প্রতিমা দেবীর সহযোগিতাতেই ১৯২১-২২ সালে কলাভবনে হাতের কাত শেখানোর ত্তন্য 'বিচিত্রা' ভবনের পত্তন হয়েছিল। এই বিচিত্রাই ছিল শ্রীনিকেতনের পূর্বসূচনা। শিল্পী বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় আশ্রমিক সংঘ প্রকাশিত প্রতিমা দেবীর কয়েকতি নির্বাচিত চিত্রের সংকলণ Pratima ঃ An Album of Paintings (1968)। [৩০]

নৃত্যকলা

শান্তিনিকেতনের নৃত্য আণ্ডোলনে প্রতিমা দেবীর অবদান বিশেষ উল্লেখ্যের দাবী রাখে। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টায় এবং রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ সমর্থনে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে তিনিই প্রথম নৃত্যচর্চার ব্যবহার করেন - ১৯২৪ সালে। এই সময় বিশ্বভারতীতে একত্তন ফার্শি ভদ্রলোক ইংরেতি সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে আসেন। তাঁর নাম ড. ত্তহাঙ্গির ভকিল। ভকিল পত্নীর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের পর প্রতিমা দেবী ত্তনতে পারেন যে তিনি গুত্তরাতে মহিলাদের মধ্যে প্রচলিত গরবা নাচ ত্তনেন। প্রতিমা দেবী তখনই তাঁকে অনুরোধ ত্তনান সেই নাচতি এখানকার ছাত্রীদের শেখাবার ত্তন্য। অধ্যাপক-পত্নী তাতে সানণ্ডে সম্মত হন। এই গরবা নাচ দিয়েই শান্তিনিকেতনের মেয়েদের মধ্যে প্রথম নাচের শিক্ষা শুরু হয়। গরবা নাচে ছাত্রীদের শিক্ষা ভালোভাবে অগ্রসর হওয়ার পর ১৯২৫ সালে শান্তিনিকেতনে 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠানে প্রতিমা দেবী ছাত্রীদের দিয়ে কয়েকতি গানের সঙ্গে গরবা নাচ তুড়ে দিলেন। তারপরেই 'শেষ বর্ষণ' শীর্ষক গানবহুল নাতকতিতে ভকিল পত্নীর পরিচালনায় আরও কয়েকতি গানের সঙ্গে গরবা নাচ যুক্ত হয়েছিল। এই ছাত্রীদলে প্রথম যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন নণ্ডলাল বসুর কন্যা গৌরী দেবী, ক্ষিতিমোহন সেন - এর কন্যা অমিতা সেন, রবীন্দ্রনাথের নাতনি নণ্ডিতা দেবী এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রী লতিকা রায়। [৩১]

এরপর প্রতিমা দেবীর আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ আগরতলা ত্রিপুরার মহারাত্তকে অনুরোধ করেন মেয়েদের নাচ শেখাবার উপযুক্ত একত্তন মণিপুরি নৃত্যশিক্ষককে পাঠাবার ত্তন্য। তিনি নবকুমার সিংহকে পাঠালেন এক মৃদঙ্গবাদক ভ্রাতাসহ। নবকুমার সিংহ ১৯২৫ সালের শেষের দিকে শান্তিনিকেতনে নৃত্যের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে ছাত্রীদের মণিপুরি নাচ মৃদঙ্গ বাদ্যের তালের সঙ্গে শেখালেন। ১৯২৬ সালে প্রতিমা দেবী ২৫ বৈশাখের দিনে রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থতির অর্ন্তরগত 'পূত্তরিনী' কবিতাতি নিয়ে নৃত্য সহযোগে পরিবেশন করাবেন বলে স্থির করলেন। তাঁর এই পরিকল্পনার কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ অতি দ্রুত 'নতীর পূত্ত' নাতকতি রচনা করেন। তিনিই এই নাতকের অভিনয় শেখাবার ভার নিলেন। গান শেখাবার দায়িত্ব নিলেন দীনেন্দ্রনাথ আর নৃত্য রচনার দায়িত্বে ছিলেন প্রতিমা দেবীর নির্দেশে আগরতলা থেকে আগত মণিপুরি নৃত্যগুরু নবকুমার সিংহ। ১৯২৭ সালের ত্তনুয়ারী মাসে 'নতীর পূত্ত' র অভিনয় হয়েছিল কলকাতায়। পরের ফেব্রুয়ারী মাসে বসন্তোৎসব উপলক্ষ্যে 'নতরাত' নামে আবৃত্তি ও নৃত্যগীতপূর্ণ নাতিকার অভিনয় হয়। ডিসেম্বর মাসে 'নতরাত' এর অদল বদল করে ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতায় যখন নৃত্যগীত আবৃত্তি সহযোগে সেতি অভিনীত হল, তখন তা পরিবর্তিত হয়ে হল ঋতুরঙ্গ। এই কতি নাতিকায় ছাত্রীরা নেচেছিল নবকুমার সিংহের কাছে শেখা মণিপুরি নাচের আঙ্গিকে। প্রতিমা দেবীর নির্দেশে ছাত্রীরা তাদের একক দলঞ্চ নাচ তৈরি করেছিল। ১৯২৯ সালে ত্তনুয়ারী মাসে মাঘোৎসব-এর সময় ত্তেড়াসাঁকোর বাড়িতে বসন্ত ঋতুর গান সহযোগে নৃত্যগীতের একতি অনুষ্ঠান হয়। ছাত্রীরা নেচেছিল মণিপুরি ও গরবা নাচের আঙ্গিকে, প্রতিমা দেবীর পরিচালনায়। [৩২]

১৯৩১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে যখন 'গীতোৎসব' ও 'শিশুতীর্থ' প্রদর্শিত হয় তখন প্রতিমা দেবীই এর পরিকল্পনা করেন। পরবর্তী সময়ে যতবার 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে নাচের প্রাধান্য ছিল বারবার। প্রতিমা দেবীর নির্দেশে ছাত্রীরা নাচগুলি তৈরি করত। ১৯৩৩ সালে 'তাসের

দেশ' নাতকতি রচনার প্রথমিক পরিকল্পনা ছিল প্রতিমা দেবীর। রবীন্দ্রনাথের হাতে সেতি ভিন্ন আকারের ভিন্ন স্বাদের নাতকে পরিণত হয়। ১৯৩১ সালের মধ্যে 'শাপমোচন', 'চিত্রাঙ্গনা','পরিশোধ', 'চন্ডালিকা', 'শ্যামা' ও 'মায়ার খেলা' নৃত্যনাত্যকে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আকারে সাতিয়েছিলেন প্রতিমা দেবীর প্রাথমিক পরিকল্পনাগুলি দেখার পর। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতাকে অবলম্বন করে ছোত ছোত আরও কয়েকতি মূকাভিনয়ও প্রতিমা দেবী ছাত্রীদের দিয়ে করিয়েছিলেন। তিনি নিতেনাচতে পারতেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে কি ভাবে মণিপুরি প্রথায় নাচ তৈরি করতে হবে, তাঁর নির্দেশ তিনি দক্ষতার সঙ্গে দিতে পারতেন। [৩৩]

প্রতিমা দেবীর একান্ত আগ্রহে ও উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ত্বীবনের শেষ পনেরো ষোলো বছরে ঐ কয়েকতি নৃত্যনাত্য রচনা করেছিলেন। তা না হলে এই নাতকগুলি আদৌ রচিত হত কি না সে বিষয়ে যথেষ্ঠ সণ্ডেহ আছে। [৩৪] এই নৃত্যনাত্যগুলির পোশাক পরিচ্ছদ প্রতিমার নির্দেশ মেনেই হত। মঞ্চসজ্জাতেও তিনি শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্য গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্র নাতক ও নৃত্যনাত্যে দৃশ্যসজ্জা ও রূপসজ্জায় যে একতি শালীন সৌণ্ডর্য্য আছে, প্রতিমা দেবী সেতি কঠোর ভাবে মেনে চলতেন।শেষ দিকে কবির নির্দেশে নাতকের মঞ্চসজ্জা কেমন হবে তার স্কেচ করে রাখতেন। তাঁর মতে রাবীন্দ্রিক নৃত্যনাত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য সংমিশ্রণ। শান্তিনিকেতনের নৃত্য কোনও বিশিষ্ট নৃত্যকলার আঙ্গিককে গ্রহণ করে নি। মিশ্র তাল ও ভঙ্গীর সাহায্যে বৈচিত্র আনা সম্ভব হয়েছে। তাই মণিপুরি আঙ্গিকে গড়ে ওঠা চিত্রাঙ্গদার নাচ সমস্ত মণিপুরে খুঁতেপাওয়া যাবে না। দক্ষিণী আঙ্গিকে তৈরী চন্ডালিকাকে চেনা যাবে না দক্ষিণী নাচের মধ্যে। মিশ্রণের এমন গুণ। এরপর এই মিশ্রনৃত্যকে দাঁড় করানো হল সংগীতের ভিত্তির উপর। সেতাই হল শান্তিনিকেতনের নতুন দান। এই সংগীতযোগে নৃত্যের পূর্ণ বিকাশ আমাদের প্রাচীন নৃত্যে দেখা যায় না। [৩৫] আত নৃত্যগীতে যে Fusion নিয়ে পরীক্ষানিরিক্ষা চলছে প্রতিমা দেবীকে তার একতন সফল পূর্বসুরি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

রবীন্দ্রনৃত্যের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য এবং সৌণ্ডর্য রক্ষার কথাও প্রতিমা দেবী ভেবেছিলেন। গানের স্বরলিপির মত নৃত্যলিপির কথাও তাঁর মনে আসে। শিল্পি হারিয়ে যাবে কিন্তু শিল্প হারাবে না। রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে যে শিল্প নৃত্যরূপ লাভ করল তার মধ্যে আছে আপন বৈশিষ্ট্য । একে ধরে রাখতে না পারলে হারিয়ে যাবে। তাই প্রতিমা আশ্রমের নতুন মেয়েদের নিয়ে নাচের ক্লাস করতেন। মেয়েদের দিয়ে নাচ তৈরি করিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখাতেন। তাঁর অনুমোদন না পেলে সন্তুষ্ট হতেন না। অনুশীলনের পর অনুশীলন চলত। তখন অবশ্য সব নৃত্য ছিল ভাবনৃত্য। গানের ভাবই প্রকাশ পেত নৃত্য ভঙ্গিমায়। প্রতিমা নিতেই নাচের মূদ্রা দেখিয়ে দিতেন। পুরোপুরি নাচ তৈরী করে দিতেন সুণ্ডর ভাবে গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে। নাচের বোল ছাত্রীদের লিখে রাখতে বলতেন এবং কলাভবনের শিল্পিদের দিয়ে নৃত্যের ভঙ্গী আঁকিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন। [৩৬] এই ক্লাসে-বাকি আমি রাখব না, কোন্ দেবতা সে, ওরে ঝড় নেমে আয়, ওগো বধূ সুণ্ডরী ইত্যাদি গানের বিশেষ নৃত্য-পরিকল্পনাগুলির পরম্পরা সংরক্ষণ করার চেষ্টা করতেন। এই ভাবে তাঁর প্রেরণায় রবীন্দ্র নৃত্যের একতি মার্গ ফুতে ওঠে। [৩৭]

সাহিত্যচর্চা

রবীন্দ্ররচনার পরিমন্ডলে বাস করে এবং দীর্ঘদিন রবীন্দ্রসান্নিধ্যে থেকে প্রতিমা দেবী সাহিত্যচর্চাতেও তাঁর অবদান রেখে গেছেন। তাঁর অনেক লেখাই রবীন্দ্রনাথ সযত্নে সংশোধন করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত কল্পিতা দেবী ছদ্মনামে প্রতিমা দেবীর অনেকগুলি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসী এবং অন্যান্য পত্রিকায়। এমনই কিছু কবিতা ও গল্পের সংকলন 'চিত্রলেখা' (আশ্বিন, ১৩৫০) লেখিকার স্বনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয়েছিল বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগ থেকে। পরবর্তী সময় প্রতিমা দেবীর রচনা যে নিতস্বতা ও পরিণতি লাভ করেছিল বিশ্বভারতী প্রকাশিত নির্বাণ (বৈশাখ, ১৩৪৯) এবং নৃত্য (বৈশাখ, ১৩৫৬) নামক ক্ষুদ্রকায় অথচ অবিস্মরণীয় গ্রন্থ দুতি তার নিদর্শন। তাঁর আর একতি গ্রন্থ স্মৃতিচিত্র একসময় প্রকাশিত হয়েছিল সিগনেত প্রেস থেকে। 'Gurudev's Paintings' এবং 'The Modern Village' তাঁর ইংরেতি রচনার অসাধারণ নমুনা (রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংশোধনের পূর্বেকার রূপ) ঃ—

এই গৃহ এই পুষ্পবীথি
যারে ঘেরি একদিন তোমার কল্পনা
গড়েছিল ইরামত দীপ্তি গরিমার,
উত্তপ্ত কামনা যার প্রতি ধূলির কণায়
ত্বীবন্ত করিয়াছিল তব মুহূর্তেরে।
যে বাসনা মনে ছিল পুরিল না
অবসন্ন প্রাণ
চলে গেল ছায়া ফেলে অঙ্গনে, প্রাঙ্গনে। [৩৯]. . . .

সমাতসেবা

প্রতিমা দেবী শান্তিনিকেতনে নারীশিক্ষা ও নারীকল্যাণের দিকতিও দেখতেন। 'আলাপিনী সমিতি' নামে একতি সংগঠন তিনি গড়েছিলেন মেয়েদের নিয়ে। এই সমিতিতে ছিল ইণ্ডিরা দেবী, হেমলতা, সুকেশী, কমলা, মীরা ও আরও অনেকে। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে সচেতনা আনার

তন্য তিনি মাঝে মাঝে দলবল নিয়ে গ্রামে নিয়ে যেতেন। গাছের ছায়ায় চৌকি পেতে বসে তাঁর বোলপুরের মেয়েদের গান শেখাতেন, গল্প বলতেন। চারপাশের গ্রামে কাতকরা পছণ্ড করতেন রবীন্দ্রনাথ। তাই প্রতিমা দেবীর ব্যবস্থায় আশ্রম থেকে মেয়েরা পালা করে গ্রামে যেতেন। কখনও হেঁতে কখনও গরুর গাড়ি চড়ে। গ্রামের মেয়েরা যারা শিক্ষার আলো পায় নি তাদের তাঁরা শেখাতেন কি করে স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরী করা যায়, শরীর ভালো করা যায় কিংবা তুকিতাকি হাতের কাতকরে তা থেকে দু'পয়সা উপার্তন করে সংসারের সাশ্রয় হয়। [৪০] এই ভাবে সেই যুগে তিনি নিঃশব্দে নারী প্রগতির ভিততি প্রস্তুত করে দেওয়ার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, একথা আতও অনেকেই তনেন না।

এই প্রসঙ্গে কারু শিল্পে তাঁর দক্ষতার কথা উল্লেখ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভ্রমণে তিনি যে যে দেশ গেছেন সেখানকার হস্তশিল্পের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাকে নিয়ে এসেছেন শান্তিনিকেতনে। আতকাপড়ের ব্যাগে, মোড়ায় বা ঘর সাত্তবার উপকরণে শান্তিনিকেতনী যে কারুশিল্প দেখা যায় তা প্রতিমা দেবীরই অবদান। রাণী চণ্ড তাঁর 'সব হতে আপন' বইতিতে লিখেছেন, "রথীদা বোঠান এনেছিলেন বিদেশ থেকে চামড়ার কাতপিতলের পাত আর পিউতর পাতের কাত।" [৪১] (পৃঃ ৩৬)। এখানে রথীদা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর বোঠান হলেন প্রতিমা দেবী।

চিঠিপত্র ৩ [৪২]

পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ১১৫তি চিঠি নিয়ে চিঠিপত্র তৃতীয় খন্ড প্রকাশিত। প্রথম পত্রতি ৭ তুলাই, ১৯১০-এ লেখা শিলাইদহ থেকে। শেষ চিঠিতি তাঁর বকলমে অন্য কেউ লিখেছেন ৩০ তুলাই, ১৯৪১-এ ত্রেড়াসাঁকো থেকে। অর্থাৎ প্রয়াণের আত/নয় দিন আগে। এখানে তিনি সম্বোধনে বলেছেন 'মামণি' এবং প্রতিমা দেবীর তুর বলে খুবই চিন্তিত। মাঝে আছে নানা ধরনের চিঠি। তভা, সুমাত্রা, বালী প্রভৃতি তয়গা থেকে লেখা বড় বড় চিঠিতে রীতিমত ভ্রমণবৃত্তান্ত। প্রথম দিকে ইতিতে নাম থামলেও ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ থেকে নামের তয়গায় বাবামশায় বসেছে।

এই চিঠিগুলি শুধু প্রতিমা দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ককেই তুলে ধরে না, দু'তনের ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুত করে। এখানেও রবীন্দ্রনাথ লিঙ্গগত কোন সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন নন। এই দুর্মূল্য চিঠিগুলির প্রাপক হিসেবে প্রতিমা দেবীর গুরুত্ব এখানেও কিছু কম নয়।

শেষের কথা

ইণ্ডিরা দেবী ও প্রতিমা দেবী — দু'তনেরই অসাধারণ গুনের অধিকারিনী ছিলেন। দু'তনেই বুণ্ডিদীপ্ত ও স্নিজ সৌণ্ডর্য সকলকেই আকৃষ্ট করত। ইণ্ডিরা দেবী চৌধুরানী রবীন্দ্রনাথের পরিবারেরই মেয়ে আর প্রতিমা দেবী ঠাকুর পরিবারের মেয়ে হলেও রবীন্দ্রনাথের পরিবারের কন্যা নন, বধূ। দু'তনের মধ্যেই আমরা বিবিধ গুণের সমাহার দেখি - তার অনেকতাই নিতস্ব, অনেকতা পারিবারিক আর অনেকতাই রবীন্দ্রসান্নিধ্যতনিত। এ কথা অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে তাঁরা উজ্জ্বল। সেই সঙ্গে এ কথা ঠিক যে যোগ্যতা না থাকলে তাঁরা এই উচ্চতায় পৌঁছেতে পারতেন না। ইণ্ডিরা দেবীর মেধা, মনন ও যুক্তিবোধ তাঁকে শুধুমাত্র একতন নারী হিসেবে নয়, একতন মানুষ হিসেবে মর্যাদা দান করেছিল। তাঁর বিদ্যাচর্চা, ভাষাচর্চা ও সাহিত্যচর্চার সঙ্গেঁ তাঁর অপরিসীম সৌণ্ডর্য বোধ—তাঁর সাতসজ্জা, গৃহসজ্জা সবই ছিল শিক্ষণীয়। রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে তাঁর দান অতুলনীয়।

অন্যদিকে প্রতিমা দেবীর ঘর গেরস্তালি অন্যরকম কিন্তু অনন্য। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ পূরণে তিনি যে যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন তা বিস্ময়কর। তাঁর সৌণ্ডর্য চেতনাও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবেউজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছিল। তিনি সাহিত্যচর্চা ও অঙ্কণশিল্পে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। সমাতসেবাও তাঁর তীবনব্যপী কর্মের একতি বিশিষ্ট দিক। তবে তাঁর মূল অবদান রবীন্দ্রনৃত্যে।বলা যায় যে তাঁরই উদ্যোগে রবীন্দ্রনৃত্য একতি আলাদা ঘরানার নৃত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন। সেই যুগে প্রতিমা দেবীর বিধবা বিবাহের ঘতনাতিও মানবীবিদ্যারচর্চার ক্ষেত্রে একতি আলোচ্য বিষয় বলে গণ্য হতে পারে।

আর একতি দিক থেকে ইণ্ডিরা দেবী ও প্রতিমা দেবী বিশিষ্ট কারণ দু'তনেই রবীন্দ্রনাথের বহু চিঠির প্রাপক। ছিন্নপত্রের গুরুত্ব ছাড়াও চিঠিপত্র পঞ্চম খন্ডে ইণ্ডিরা দেবী ও চিঠিপত্র তৃতীয় খন্ডে প্রতিমা দেবীকে লেখা চিঠিগুলি রবীন্দ্রচর্চায় অমূল্য সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। সর্বোপরি শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীতে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, হরিচরণ বণ্ড্যোপাধ্যায়, ক্ষিতিমোহন সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী বা সি. এফ্. এন্ড্রুতের মত বত্রিশ তন শিক্ষকের বত্রিশ সিংহাসনে ইণ্ডিরা দেবী ও প্রতিমা দেবী নিত যোগ্যতায় আসন লাভ করেছিলেন। এর দ্বারাই তাঁরা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

এই ভাবে সেইযুগে ইণ্ডিরা দেবী চৌধুরানী ও প্রতিমা দেবী তৎকালীন শান্তিনিকেতনের সফল পুরুষদের পাশাপাশি নিতেদের প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁদের কর্মকৃতি তেমন প্রচারের আলোয় আসে নি। মানবীবিদ্যাচর্চায় তাঁরা দু'তনেই গুরুত্বপূর্ণ আসন দাবি করেন। সেই সঙ্গেঁ রবীন্দ্র সংস্কৃতিচর্চাও তাঁদের কাছে বিশেষ ভাবে ঋনী এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে।

তথ্যসূত্র

১। Neera Desai and Maitreye Krishnaraj (1987) women and Society in India, New Delhi, Ajanta, Introduction, p-2
২। ibid, pg - 4-5
৩। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৪০৯ বঙ্গাঁব্দ) শান্তিনিকেতনের এক যুগ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ,
৪। চিত্রা দেব (২০১৩) ঠাকুরবাড়ির অওরমহল, কলকাতা, আনণ্ড, পৃ ৮১
৫। ইণ্ডিরা দেবী চৌধুরানী (১৯৯৭) স্মৃতিসম্পুত প্রথম খন্ড, গ্রন্থপরিচয়, বিশ্বভারতী,শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রভবন, পৃ ১৮৩
৬। তদেব
৭। তদেব
৮। তদেব
৯। চিত্রা দেব, তদেব, পৃ ৮৩
১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪০০ বঙ্গাঁব্দ) চিঠিপত্র পঞ্চম খন্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ ১৩
১১। চিত্রা দেব, তদেব, পৃ ৮৩-৮৪
১২। ইণ্ডিরা দেবী চৌধুরানী, তদেব, পৃ ১৮৩
১৩। ইণ্ডিরা দেবী চৌধুরানী (১৯৯৯) স্মৃতিসম্পুত দ্বিতীয় খন্ড, বিশ্বভারতী,শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রভবন, পৃ ১১০
১৪। তদেব, পৃ ১১৩
১৫। চিত্রা দেব, তদেব, পৃ ৮৬
১৬। তদেব, পৃ ৮৬-৮৭
১৭। তদেব পৃ ৮৭
১৮। তদেব পৃ ৮৭
১৯। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৪০৯ বঙ্গাব্দ) শান্তিনিকেতনের এক যুগ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ ২১৮
২০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩১৯ বঙ্গাব্দ) ছিন্নপত্র-সংযোতন, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৃ ২৮৭
২১। তদেব, পৃ ২৮৮
২২। তদেব, পৃ ২৯৩
২৩। তদেব
২৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪০০ বঙ্গাব্দ) চিঠিপত্র -৫, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ ২১৮
২৫। ইণ্ডিরা দেবী চৌধুরানী (১৯৯৭) স্মৃতিসম্পুত প্রথম খন্ড, গ্রন্থপরিচয়, বিশ্বভারতী,শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রভবন, পৃ
২৬। ইণ্ডিরা দেবী চৌধুরানী (১৯৯৯) স্মৃতিসম্পুত দ্বিতীয় খন্ড, গ্রন্থপরিচয়, বিশ্বভারতী,শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রভবন,
২৭। রানী চণ্ড (১৪০১ বঙ্গাব্দ) সব হতে আপন, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ ২১৬-২২০
২৮। প্রতিমা দেবী (২০০৭) স্মৃতিচিত্র, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য, কলকাতা, দেত পাবলিশিং, পৃ ৫৯
২৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪০০ বঙ্গাব্দ) চিঠিপত্র -৫, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ ৫৯
৩০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৩) চিঠিপত্র -৩, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ ১৭৫-১৭৬
৩১। শান্তিদেব ঘোষ (১৪১৩ বঙ্গাব্দ) জীবনের ধ্রুবতারা, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৃ ১৩৬-১৩৭
৩২। তদেব, পৃ ১৩৭
৩৩। তদেব, পৃ ১৩৭-১৩৮
৩৪। তদেব, পৃ ১৩৮
৩৫। চিত্রা দেব, তদেব, পৃ ১৫৫-১৫৬
৩৬। তদেব, পৃ ১৫৫-১৫৬
৩৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৩) চিঠিপত্র -৩, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৃ ১৭৭-১৭৮
৩৮। প্রতিমা দেবী (২০০৭) স্মৃতিচিত্র, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য, কলকাতা, দেত পাবলিশিং, পৃ ৬-৭
৩৯। চিত্রা দেব, তদেব, পৃ ১৫২
৪০। তদেব, পৃ ১৫৬
৪১। রানী চণ্ড, তদেব, পৃ ৩৬
৪২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৩) চিঠিপত্র -৩, কলকাতা, বিশ্বভারতী।